ফির্কাবাজী, কুফুরী ফতোয়া

ও

ইসলাম

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

ফির্কাবাজী, কুফুরী ফতোয়া
ও
ইসলাম

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৫
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৬

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তৌহীদ হল ইসলামের প্রাণ। আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। বিশ্বের সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। মুসলমানরা এক ও অভিন্ন উম্মা বা জাতির সদস্য। তাদের রসূল এক এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ আল্ কোরআনও এক।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই তৌহীদ পন্থী মুসলমানরা আজ শতদলে বিভক্ত। এদের একদল অপর দলকে অমুসলমান ও কাফির জ্ঞান করে। দাবী করা হয় সমগ্র পৃথিবীতে একশত কোটি মুসলমান। অথচ ফতোয়ার বেলায় এক ফির্কা অপর ফির্কার মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে মনে করে। 'তৌহিদী জনতা' শুধু শ্লোগানের বেলায় এক।

প্রকাশক

বিষয় সূচী ঃ

১।	ফির্কাবাজী	৫
২।	কুফরী ফতোয়া	৮
৩।	নাজাত বা মুক্তি প্রাপ্ত জামাত কোন্‌টি	১৫
৪।	নূতন ফতোয়া	১৮
৫।	সরকার বা কোন সংসদ কি ফতোয়া দিতে পারে ?	১৯
৬।	মুসলমান কে ?	১৯
৭।	আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস	২০
৮।	মৌলবাদী ইসলাম ও মৌলিক ইসলাম	২১
৯।	ইসলামী পরিভাষা	২৯

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ফির্কাবাজী

পবিত্র কোরান বলে, মানুষই ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট আছে (মোমেনুন ৫৪)। অথচ আল্লাহ্‌তা'লা বলেছিলেন, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং মতভেদ করোনা (শূরা ১৪)। আল্লাহ্ বলেছিলেন, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়োনা (বনী ইসরাঈল ৩৭)। তিনি বলেছিলেন, তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা (আলে ইমরান ১০৪); কিন্তু শয়তান প্রকৃতির লোকেরা বারবারই নবীর শিক্ষাকে বিকৃত করেছে এবং বারবারই আল্লাহ্‌তা'লা সংশোধনের ব্যবস্থা করেছেন (হজ্জ ৫৩)। যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করে দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে তাদের সঙ্গে নবীর কোন সম্পর্ক নেই (আনআম ১৬০)।

মহানবী (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, ওয়া উদ্‌তুম মিন হায়ছু বা'দাতুম অর্থাৎ তোমরা আবার পূর্ববৎ বিভক্ত হয়ে পড়বে (মুসলিম)। ইসলাম এসেছিল তৌহীদের বাণী নিয়ে। ইসলামের মূলমন্ত্র হলো, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, সমগ্র মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত (মুমিনূন ৫৩, বাকারা ২১৪) এবং তাদের ধর্মও এক। কিন্তু নবী করীমের (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জানা যায় যে, একদা এই তৌহীদপন্থী মুসলমান বহুদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে ফেতনা ফসাদে লিপ্ত হবে। নবী করীম (সাঃ) বলে গিয়েছিলেন, লা ইয়াতি আন্না আলা উম্মাতি কামা আতা আলা বনী ইসরাঈল অর্থাৎ মুসলমানরা হুবহু ইহুদীর ন্যায় হয়ে যাবে (তিরমিযী)। অন্যত্র বলেছেন, তাত্তাবিয়ান্না সুনানা মান

কাবলাকুম-রীতিনীতিতে এই উম্মত পূর্ববতী উম্মতের অনুরূপ হয়ে যাবে (মেশকাত)। তাফতারিকু উম্মাতি আলা ছালাছিউ ওঁয়া সাবঈনা ফিরকাতিন কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা ওয়াহেদাতান ওয়াহিয়াল জামা'ত (মেশকাত) অর্থাৎ মুসলমানরা ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি জামাত ছাড়া অবশিষ্ট ৭২ ফিরকাই দোযখগামী হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে আমরা দেখতে পাই, মুসলমানরা নিজ হাতে দুই খলীফাকে হত্যা করে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। প্রাথমিক অবস্থাতেই শিয়া সুন্নী এই দুই ভাগে মুসলিম সমাজ ভাগ হয়ে যায়। মহানবী (সাঃ) বলে দিয়েছিলেন, আমরা পর মাত্র ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে খিলাফত বিনষ্ট হয়ে গিয়ে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে (মেশকাত)। চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (রাঃ) পর উমাইয়াদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র। এরপর শুরু হয় বিচ্ছিন্ন হওয়ার পালা। শিয়া সুন্নী এই দুই দলও আরো বহু উপদলে ভাগ হতে থাকে। শিয়ারা ইমামত নিয়ে গণ্ডগোল করে ইসনে আশারী ও সাবিয়া ইমামী এই দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। এরা সুন্নীদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক প্রমাণ করবার জন্য কলেমাকেও পরিবর্তন করে ফেলে। শিয়াদের কলেমা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ ওয়া আমিরুল মুমিনিন আলীয়ান ওলী আল্লাহ্ ওছিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ওয়া খলীফাতু বেলা ফছল। এমন কি এরা বর্তমান কোরআনের উপরও আপত্তি উত্থাপন করে বলে যে, আসল কোরআনে নাকি সত্তর হাজার আয়াত রয়েছে এবং যা বর্তমান কোরআনে নেই (আল্ কাফী ২/৬৩৪)। শিয়াদের একটি দল যারা ইসমাঈলী বা আগাখানী বলে পরিচিত, তারা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সব ব্যাপারেই নতুন বিধান চালু করেছে। তারা তাদের প্রার্থনায় কোরআনের পরিবর্তে গুজরাটী ভাষায় গিনান থেকে পাঠ করে এবং জামাতখানায় তাদের হাজের ইমামের নাম উচ্চারণ করে তার আসনকে সামনে রেখে সেজদা করে। এমনি অসংখ্য ছোট বড় পার্থক্য সৃষ্টি হয় ধর্মীয় রীতিনীতিতে। শিয়ারা সুন্নীদের হাদীস গ্রন্থ মেনে চলে না। সুন্নীদের কাছে যেমন বোখারী তেমনি শিয়াদের কাছে কুলাহনীকৃত আল্ কাফী। ইমাম খোমেনীর মতে শিয়া ইমামদের মর্যাদা ফেরেশ্তা ও নবীদের চাইতেও বেশী (আল্ হুকুমাতে ইসলামিয়া ৫২ পৃঃ)। মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, বাহাত্তরটি ফিরকা হবে।

তাই আজ হয়েছে অসংখ্য ফিরকা। এই সব ফিরকার মধ্যে ইসনে আশারা, ইসমাঈলীয়া, কারামাতিয়া, বাতিনিয়া, তালিমিয়া, মুস্তালিয়া, নিজারিয়া, কায়সানিয়া, নুছায়িরি, খারেজী, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, ওহাবী, সিন্নাবীয়া, মারাজিকা, কান্নাছিয়া, আনবাবীয়া, হাম্মুদিয়া, মানাইফিয়া, ছাল্লামিয়া, হালাবিয়া, জাহেদিয়া, শুয়াইবিয়া, তাছলিয়ানিয়া, আবাহিয়া, মুতুহিয়া, বুন্দারিয়া, শুরুনবুলালিয়া, বাইউনিয়া, আদাহমিয়া, কুবরারিয়া, আয়দারুসিয়া, আম্মাবিয়া, আল্লাবিয়া, আকবারিয়া, হাতেমিয়া, ইছাবিয়া, আউআমেবিয়া, আজজুজিয়া, বাবাইয়া, বায়বামিয়া, হামজাবিয়া, শায়খিয়া, হিম্মাতিয়া, বাক্কাইয়া, ফাদালিয়া, সিদিয়া, তাছিকহিয়া, বিবারিয়া, বুনুহিয়া, জাহাবিয়া, জালওয়াতিয়া, হাশিমিয়া, রওশনিয়া, ফানাইয়া, হুদাইয়া, জাররাহিয়া, খালওয়াতিয়া, জাবুলিয়া, হামাদিশা, দারকাওয়া, তাইবিয়া, জুনাদিয়া, মালামাতিয়া, পীর হাজাত, রিফাইয়া, ছাত্তারিয়া, ইউনুছিয়া, উলউয়ানিয়া, তাববাইয়া, ছিদ্দিকিয়া, শাজিলিয়া, নবুবিয়া, নিমাতাল্লাহিয়া, মুরাদিয়া, মুহাছিবিয়া, কুশাইরিয়া, কুনিয়াবিয়া, খামুছিয়া, মাদানিয়া, হুলমানিয়া, হাবিবিয়া, হাকিমিয়া, হাফনাবিয়া, হায়দারিয়া, গুরুজমার, গাজিয়া, গাজ্জালিয়া, দাউছিয়া, ফেরদৌসীয়া, মাওলবীয়া, পুস্তনিশিয়া, ইরশাদিয়া, দাউদী, সোলায়মানী, বোহরা, মেমন, ফারাইজিয়া, নুরবকশীয়া, কায়সানী, ইবাদি, মুরজি, দুরুজ, তিজানী, কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নকশ্‌বন্দিয়া, মুজাদ্দেদীয়া, আহলে হাদীস, সোহরাবর্দিয়া, আহলে কোরআন জায়দীয়া প্রভৃতি।

ইসলামের পরিণতি কি এই বিছিন্নতার মধ্যেই ? না। ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম (আলে ইমরান ২০)। ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে (মায়েদা ৪) তাই নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্ মোমেনদেরকে নিরাশ হতে বারণ করেছেন (হিজর ৫৭)। যিনি এই ধর্মের প্রবর্তন করেছেন তিনিই এর সংরক্ষণ করবেন (হিজর)। মহানবী (সাঃ) এ-ও ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, উবশিরুকুম বিল মাহদী ইউবআছু ফি উম্মাতি আলা ইখতিলাফিন অর্থাৎ তোমাদেরকে মাহদীর সুসংবাদ দিচ্ছি তিনি আমার উম্মতের এমন এক সময় আবির্ভূত হবেন যখন মানুষের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিবে (নজমুস সাকেব ২/১১২)।অন্য এক

হাদীসে আছে, ইউশেকুমান আশা মিনকুম আই ইয়ালকা ঈসাবনা মারয়ামা হাকামান আদলান ইমামাম মাহদীয়ান (মসনদ আহমদ) অর্থাৎ সকল ইখতেলাফের মীমাংসাকারীরূপে ঈসা ইবনে মরিয়মের রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন। তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন, ফাইযা রাআইতুমুহু ফাবাইউহু ওয়ালাও হাবওয়ান আলাছ ছালজে ফাইন্নাহু খালীফাতুল্লাহিল মাহদী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র খলীফা ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তোমরা তাঁর বয়াত করবে যদি বরফের পাহাড় ডিঙ্গিয়েও যেতে হয় তবু যাবে (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, বিহারুল আনোয়ার)। ফাল ইয়াকরাউ মিন্নিছ ছালাম অর্থাৎ তাঁকে আমার ছালাম পৌঁছিয়ে দিও (দুর্‌রে মনসূর, বিহারুল আনোয়ার)। বলা হয়েছে, মাহদীর যুগে সকল ফিরকার বিলুপ্তি ঘটবে। তখন সবাই আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নতের অনুসারী হবে (হাদীসুল গাসিয়া ১৫৫)। মাহদীর সঙ্গীরা রসূল করীমের (সাঃ) সাহাবীদের অনুরূপ হবেন (নজমুস সাকেব)। তাঁর দল সমগ্র জগতের বিভিন্ন শহরে মসজিদ নির্মাণ করবে (ইকতেরাবুস্ সায়াত ৯১)। আল্লাহ্'তালা পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে ইসলামের কলেমাকে প্রবেশ করাবেন (মেশকাত) অর্থাৎ পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলাম প্রচারিত হবে। ইমাম মাহদীর (আঃ) দ্বারাই ইসলামের অভ্যন্তরীণ ইখতেলাফ বা মতভেদ দূরীভূত হয়ে তাঁর হাতেই পুনরায় খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে।

কুফরী ফতোয়া

আজকাল ফতোয়ার খুবই ছড়াছড়ি। কথায় কথায় ফতোয়া। ভিন্ন মতাদর্শের লোককে আদর্শ ও যুক্তির মাধ্যমে নিজের মত ও পথে আনার যাদের সাধ্য নেই তারাই সাধারণতঃ ফতোয়ার মাধ্যমে অপরকে কেটে ছেটে কাফের বানাতে বেশী ওস্তাদ। যুক্তি যেখানে অচল, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, সেখানেই জন্ম নেয় এহেন ফতোয়া, একথা সবাই জানেন। একদল তথাকথিত আলেম সব সময় প্রগতির বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদানে সোচ্চার। ইংরেজী শিখলে কাফের হয়ে যাবে। কুরআনকে ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করলে মহাপাতকী হতে হবে, এই ফতোয়া কারো অজানা নয় ! শাহ ওয়ালীউল্লাহ্

মোহাদ্দেছ দেহলবী এ দেশে সর্ব প্রথম ফারসীতে কোরআন অনুবাদ করে তৎকালীন মোল্লা সম্প্রদায় কর্তৃক কুফরী ফতোয়ায় ভূষিত হয়েছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদকে 'কাফের' হতে হয়েছিল ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করে। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে তথাকথিত আলেমের দল কাফের বলেছিল।

এমনি যুগে যুগে আগত মোজাদ্দেদবৃন্দকেও সমসাময়িক আলেমরা ফতোয়ার তরবারিতে বার বার আঘাত হেনেছে। ইমাম মাহদী (আঃ) সম্বন্ধে পূর্ব থেকে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সমসাময়িক মৌলবী মৌলানা যারা পূর্বপুরুষদের ও পীর পুরোহিতদের অন্ধ-অনুকরণে অভ্যস্ত তারা বিরোধিতা করবে এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ও গোমরাহির ফতোয়া দিবে এবং তাঁকে অস্বীকার করবে (মকতুবাত ২য় খণ্ড ৫৫নং মকতুব)। হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবীও বলেছেন, "যখন ইমাম মাহদী (আঃ) জাহির হবেন তখন মোল্লা-মৌলবীরাই তাঁর প্রধান শত্রু হবে (ফতুহাতে মক্কিয়া ৩৭৪ পৃঃ)। এমন কি হালের মৌদুদী সাহেব পর্যন্ত বলেছেন, 'ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে মৌলবী ও সুফী সাহেবরাই সবার আগে চিৎকার শুরু করবেন (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন ২৫ পৃঃ)। উক্ত পুস্তকে এ-ও উল্লেখিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী যুগেও সর্বজনমান্য ইমামদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে। যেমন ইমাম আবূ হানিফা (রাঃ) বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাস উভয়ের আমলে বেত্রদণ্ড, কারাদণ্ড ভোগ করেন। এমনকি অবশেষে তাঁকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়। ইমাম মালিককে (রাঃ) আব্বাছিয়া বাদশা মনসুরের আমলে ৭০টি বেত্রদণ্ড দেওয়া হয় এবং এমন ভীষণভাবে তাঁকে পিঠমোড়া করে বাঁধা হয় যে, তাঁর হস্তদ্বয় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উপর মামুন, মো'তাসিম ও ওয়াসিক তিন জনের আমলেই অনবরত নির্যাতন চালানো হয়। তাঁকে এত বেশী মারপিট করা হয় যে, সম্ভবতঃ উট এবং হাতীও সে মারের পর জীবিত থাকতে পারত না (ঐ ৪৩ পৃঃ) মৌদুদী পন্থী জাহানে নও পত্রিকা ১৩৬৯ সালের এক বিশেষ সংখ্যায় যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে স্বয়ং নবী করীমের (সাঃ) বিরুদ্ধেও সমসাময়িক ধর্মান্ধরা যা করেছিল তার উল্লেখ করেছে। যথা–"যাহাতে কেহ

গ্রহণ করিতে না পারে তাহার জন্য নবী করীমকে (সাঃ) ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিয়া লোকদিগকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁহার অনুসারীগণ ধৈর্যসহকারে এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ বরদাস্ত করিলেন। বস্তুতঃ সমস্ত আদর্শ-ভিত্তিক আন্দোলনের এই হওয়া উচিত। ..... ঠাট্টা-বিদ্রূপের সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরা মিথ্যারও আশ্রয় গ্রহণ করিল। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করিয়া চালাকদিগকে এই দাওয়াতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাইল" (২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এখন আমরা কিঞ্চিৎ নমুনা পেশ করে দেখাতে চেষ্টা করব যে, এইসব ফতোয়াবাজরা একে অপরের বিরুদ্ধে কি ধরনের ফতোয়াবাজী করেছেন। এদের ফতোয়াকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে পৃথিবীতে একজন মুসলমানও খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না। কোন কোন দলের ফতোয়ায় সমগ্র উম্মতে মোহম্মদীয়াই কাফির ও বেদীনে (নাউযুবিল্লাহ্) পরিণত হয়ে যাবে। শিয়াদের সম্বন্ধে সুন্নীদের ফতোয়া হল,–"শিয়া ইসনে আশারিয়া নিশ্চিতভাবে ইসলাম হতে খারিজ। শিয়াদের সঙ্গে বিবাহের আদান-প্রদান সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং তাদের যবাই করা জীব হারাম। তাদের চান্দা মসজিদে ব্যবহার করা নাজায়েয। তাদের জানাযা পড়া ও জানাযায় শরীক করাও নাজায়েয (ফতোয়া আন নজম, লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত)। রাফেজী শুধু মুরতাদ, কাফির এবং ইসলামের দায়রা হতেই খারিজ নয় বরং ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু (শুবা তালিমাত দারুল উলুম, দেওবন্দ)। সমস্ত রাফেজী সম্বন্ধে নিশ্চিত ও ধ্রুব সত্য ইজমায়ী হুকুম এই যে, তারা কাফির ও মুরতাদ (আহমদ রেজা খান বেরেলভী)। শিয়া ইমামিয়া ফেরকা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের খেলাফত স্বীকার করে না। ফেকাহ্‌র কিতাবে লেখা আছে, যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকরের খিলাফত অস্বীকার করল সে ইজমাকে অস্বীকার করল এবং কাফির হয়ে গেল (ফতোয়ায়ে আজিজি ১৯১, ১৯২ পৃঃ)। অনুরূপ আছে, যে হযরত আবূবকর ও হযরত ওমরের খিলাফত অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরি ২য় জিলদ ২৮৩ পৃঃ)। এখন সুন্নীদের সম্বন্ধে শিয়া আলেমদের ফতোয়া শুনুন। যে ব্যক্তি ইমামদেরকে অস্বীকার করেছে সে কাফির এবং যে আমাদেরকে স্বীকারও করে নাই এবং অস্বীকারও

করে নাই সে গোমরাহ্ (আস্ সাফী শরহুল উসুলিল কাফী ৩য় খণ্ড ৬১ পৃঃ)। শিয়া ভিন্ন অন্য কেহ নাজাত পাবে না (হাদিকায়ে শুহাদা ৬৫ পৃঃ)। যদি কোন শিয়া কোন সুন্নীর জানাযায় শরীক হয় তাহলে সে এইভাবে দোয়া করবে–হে খোদা তুমি তার পেট আগুন দিয়ে ভরে দাও, তার কবরেও আগুন প্রজ্বলিত কর এবং তার শাস্তির জন্য সাপ বিচ্ছু প্রেরণ কর (ফুরুউল কাফি, কিতাবুল জানায়েয ১ম জিলদ, ১০০ পৃঃ)। এখন সুন্নীদের ভিতরকার ফতোয়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি, "আহমদ রেজা খান বেরেলভী এবং তার অনুচর সহচর সবাই কাফির, যে তাদেরকে কাফির বলবে না সে-ও কাফির, যে তাদেরকে কাফির বলতে সন্দেহ করে সে-ও কাফির (রদ্দূত তকফীর ১১ পৃঃ)। এর উল্টা ফতোয়া হল–"দেওবন্দের আলেমগণ তাদের সাঙ্গ পাঙ্গসহ সকলেই মুসলমানদের ইজমায়ী ফতোয়া অনুযায়ী কাফির, মুরতাদ এবং ইসলাম হতে খারিজ। ..... যে ব্যক্তি তাদের মুরতাদ ও কাফির হওয়াতে সন্দেহ পোষণ করে সে-ও মুরতাদ ও কাফির, আর এই সন্দেহকারীর কাফির হওয়াতে যে সন্দেহ করে সে-ও কাফির ও মুরতাদ (তিনশত আলেমের ফতোয়া, হাসান বরকিন্দ্রে প্রেসে মুদ্রিত, ইশতিয়াক মনজিল লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত)। আহলে হাদীসদেরকে হানাফীরা লা-মজহবী বলে থাকে অর্থাৎ ধর্মহীন। এ সম্বন্ধে বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কথা সাহিত্যিক আবুল মনসুরের আত্মজীবনীমূলক বইগুলি পড়ে দেখুন। মোকাল্লেদ আলেমরা ফতোয়া দিয়েছেন, "আহলে হাদীসগণ ইসলামী উম্মতের ইজমা' অনুযায়ী মুরতাদ, কাফির এবং ইসলাম থেকে খারিজ। যারা তাদের কথা বিশ্বাস করবে তারা কাফির ও গোমরাহ হবে, তাদের পেছনে নামায পড়া, তাদের যবাই করা জীব খাওয়া মুরতাদের দলভুক্ত হওয়ার সামিল (৭৭ জন আলেমের দস্তখত সহ লক্ষ্ণৌ থেকে মুহাম্মদ কাদেরী প্রকাশিত ফতোয়া)। গয়ের মোকাল্লেদের চিহ্ন হল জোরে আমীন বলা, রাফেইয়াদাইন করা, নামাযে বুকের উপর হাত বান্ধা, ইমামের পিছনে আলহামদু পড়া। এহেন ব্যক্তিরা সুন্নত জামাত থেকে খারিজ এবং রাফেজী, খারেজী প্রভৃতি গোমরাহ্ ফেরকার সমতুল্য (জামেউশ শাওয়াহীদ ফি ইখরাজিল ওহাবীনা আনিল মসজিদ, এতে ৭০ জন আলেমের দস্তখত আছে)। শেখুল হিন্দ মাহমুদ হাছান দেওবন্দী, আশরাফ আলী থানবী, সৈয়দ হাছান আমরোহীসহ বহু আলেম শিহাব সাকেব

কিতাবে ফতোয়া দিয়েছেন, 'আরবের আবদুল ওহাব নেজদীর হাতে বহু মুসলমান শহীদ হয়েছেন। সে ছিল অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্ত পিপাসু ফাছেক।' শেখুল হাদীস আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বোখারীর শরাহ্ ফজলুল বারীর ভূমিকায় লিখেছেন–আবদুল ওহাব নজদী একজন কম এলেমধারী লোক, এই জন্যই সে কুফরী হুকুম দিত বেপরোয়াভাবে। উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান সৌদী আরবের শাসক গোষ্ঠী এই ওহাবী মতাবলম্বী। এখন মোকাল্লেদদের সম্বন্ধে আহলে হাদীসদের ফতোয়া শুনুন, "চারি ইমামের অনুসারী, চারি তরিকার অনুসারী হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী, হাম্বলী এবং চিশ্‌তীয়া, কাদেরীয়া, নকশবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া প্রভৃতি লোক মুশরেক ও কাফির (মজমুয়া ফতোয়া ৫৪, ৫৫ পৃঃ)। বর্তমান যুগের মুসলমানদের সম্বন্ধে মৌদুদী সাহেব বলেছেন, 'আহলে হাদীস, হানাফী, দেওবন্দী, বেরেলী, শিয়া, সুন্নী প্রভৃতি ফিরকা, জাহেলিয়াতের উৎপাদন' (খোতবাত ৭ম সংস্করণ ৭৬ পৃঃ)। তিনি জন্মগত মুসলমানদেরকে আহলে কিতাব বা ইহুদী খৃষ্টানের অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন (সিয়াসী কশমকশ ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ ১৩৩ পৃঃ)। তিনি তার জামাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া বলেছেন (রোয়েদাদ জামাতে ইসলামী ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ৮ পৃঃ)। আর এজন্য সুন্নী উলেমাগণ ফতোয়া দিয়েছেন, মৌদুদী জামাত একটি গোমরাহ জামাত, এদের আকায়েদ আহলে সুন্নত জামাত ও কোরআন হাদীসের খেলাফ (মৌলানা হোসেন আহমদ মদনী)। আসল দাজ্জালের পূর্বে যে ত্রিশজন দাজ্জাল বের হবে মৌদুদী তার একজন (মৌলানা রেজওয়ান, হেজবুল্লাহ দারুত তছনীফ থেকে প্রকাশিত ওহাবী ও মৌদুদী ভ্রান্ত মতবাদ নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)। মৌদুদী পন্থীদের পিছনে নামায পড়া মকরুহ তাহরীমা (মৌলানা মাহদী হাছান, মুফতী দেওবন্দ, মৌলানা আবদুল্লাহ, মুফতী মুলতান, মৌলানা এহ্‌তেশামুল হক থানবী, করাচী, আরাকীনে লাজনাতুল ক্বাজা ওয়াল এফতা সরসিনা, এ ব্যাপারে আরো দু'হাজার আলেমের দস্তখত আছে দেখুন, মৌদুদী জামাতের স্বরূপ পুস্তিকা)। মৌদুদী পন্থীদের সম্বন্ধে ৩০৮ জন উলেমার ফতোয়া দেখুন–দৈনিক পাকিস্তান, ২রা মে ১৯৭০। মুফতী মাহমুদ মৌলানা মৌদুদীকে ইসলাম থেকে খারিজ ঘোষণা করে এ ব্যাপারে অন্যদেরও সমর্থন দাবী করেছেন (পূর্ব দেশ ১৯/১০/৬৯)।

মৌদুদী সাহেব রাজনৈতিক মিছিল করতে গিয়ে নামায পর্যন্ত পরিত্যাগ করতেন (শাহাব পত্রিকা, দৈনিক ইত্তেফাক ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ বাংলা)। এ ধরনের আরো অসংখ্য ফতোয়া আমাদের হাতে রয়েছে। আর এজন্য মৌলানা আবদুল্লাহেল কাফী লিখেছেন, "এদের দলপরস্তী, গোঁড়ামী, অন্ধ অহমিকতা ও হাদীস বিদ্বেষ তাহাদিগকে ক্রমশঃ মুসলিম জনমণ্ডলী হইতে দূরেই সরাইয়া রাখিবে" (ইসলামী জামাত বনাম আহলে হাদীস আন্দোলন শেষ পৃঃ)। বাংলাদেশের প্রাচীন পত্রিকাসমূহেও হানাফী মোহাম্মদীদের ঝগড়া-বিবাদ ও বহসের সংবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হত (দেখুন সুলতান ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৩৩০ বাংলা, শরিয়ত ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১২৩২ বাংলা, সুলতান ৮ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১৩৩০ বাংলা প্রভৃতি)।হালেও এইসব ফতোয়া বিশারদ বিভিন্ন মত ও পথের আলেম সম্প্রদায় সকল প্রকার প্রগতিমূলক কর্ম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে ফতোয়ার প্লাবন বইয়ে চলেছেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে এদের প্রভাব দিন দিনই ক্ষীণ এবং মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। আর এই অবস্থা উপলব্ধি করে তারা এখন নিজেরা সরাসরি ফতোয়া না দিয়ে কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির ছত্র ছায়ায় থেকে তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে তৎপর। আর এজন্য বিভিন্ন দেশে এইসব আলেম সম্প্রদায় নিজ নিজ সরকারের নিকট তাদের বিপক্ষকে অমুসলমান ঘোষণার জোর দাবী জানিয়ে আসছেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যে সব উলামাদের উস্কানীতে একটি ইসলাম প্রচারকারী দলের উপর রাজনৈতিক কুফরী ফতোয়া আরোপ করেন শেষ পর্যন্ত সেই আলেমগণই কুফুরী ফতোয়ায় স্বয়ং ভুট্টো সাহেবকেও ভূষিত করেন। ভুট্টো সাহেবের ভাষায় শুনুন, "আমার উপর কুফরীর ফতোয়া লাগান হয়েছে, যার জন্য আমার মনের অবস্থা শুধু সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে যে নিজে মুসলমান, এবং একজন সত্যিকার মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করলে তার যে অবস্থা হবে তাই আমারও হয়েছে" (নওয়ায়ে ওয়াক্ত, ১৪ই নভেম্বর ১৯৭৪ইং)। অথচ এই আলেমরাই নিজেদের দাড়ি দ্বারা তার বুট পালিশ করবেন বলে জানিয়েছিলেন (পাকিস্তান টাইমস, লাহোর)।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "যদি কেউ কাউকে কাফির বলে আর ঐ ব্যক্তি যদি কাফির না হয়ে থাকে তাহলে যে কাফির বলল সে কাফির হয়ে যায়"। (মুসলিম) আমরা উপরে দেখেছি একদল অপর দলকে যে ঢালাওভাবে কাফির

আখ্যা দিয়েছে তাতে ঐ হাদীস অনুযায়ী কে যে ইসলামের গন্ডির মধ্যে অবশিষ্ট থাকে তা বলা খুবই মুস্কিল। আর এজন্যই পাঞ্জাব দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে জাষ্টিস মুনির ও জাষ্টিস কায়ানী বলেছিলেন, "মুসলমানদের কোন দলই মুসলমানের সংজ্ঞার ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। একদলের অভিমত গ্রহণ করলে অবশিষ্ট সকল দলই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, আর এজন্য আমরা এ ব্যাপারে কোন নূতন সংজ্ঞা দিতে গেলাম না। কেননা, তাতে সেই একই অবস্থার অবতারণা হবে (পাঞ্জাব তদন্ত আদালতের রিপোর্ট–পাকিস্তান পাবলিকেশন থেকে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত)।

ইসলাম এসেছিল দুনিয়ার সকল অমুসলমানকে মুসলমান বানাতে, সমগ্র বিশ্বে ইসলামের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাকথিত উলামা সমাজ, সেদিকে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যকে প্রয়োগ না করে তাদের সমস্ত শক্তির অপচয় ঘটিয়েছেন এই কুফরী ফতোয়ার মধ্যে। তারা যেন মুসলমানকে অমুসলমান বানিয়ে আনন্দ পান বেশী। এই অবস্থা দেখে মহানবীর (সাঃ) সেই পবিত্র বাণীই বার বার মনে পড়ছে, উলামাউহুম-শাররুমান তাহতা আদিমিচ্ছামায়ী, মিন ইনদিহিম তাখরুজুল ফিতনাতু ওয়া ফিহিম তাউদ–অর্থাৎ ঐ সব আলেমরা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হবে। তাদের মধ্যেই ফেতনা জন্ম নিবে এবং তার ফলাফল তাদের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করবে। আজ এই হাদীসের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে।

এখানে কোরআন হাদীস থেকে দুই একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তোমরা তাদেরকে মোমেন নও বলো না" (সূরা নেসা ১৩ রুকূ) অর্থাৎ যারা সালাম বলবে তাদেরকে কাফির বলা অনুচিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবাই করা প্রাণীর মাংস খায় সে মুসলমান। তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ্ ও রসূলের উপরে। সুতরাং আল্লাহ্‌র এই দায়িত্বভারের অবমাননা করো না, একে তুচ্ছ জ্ঞান করো না এবং এর মর্যাদাহানীও করো না" (বোখারী কিতাবুস্ সালাত)। ইমাম আবূ হানিফা এর আলোকে বলেছেন, "যারা কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে

তাদেরকে আমরা কাফির বলি না। যদি কারো মধ্যে কুফরীর ৭০টি লক্ষণ এবং একটি মাত্র ঈমানের লক্ষণ দেখা যায় তাহলে আমরা তার উপর কুফরী ফতোয়া প্রয়োগ করি না। এই হল আল্লাহ্ রসূল ও প্রাথমিক যুগের উলামায়ে কেরামের অভিমত। আমাদেরকে এগুলি আলোক বর্তিকা করে পথ চলতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্ ও রসূলের নাফরমান হয়ে পাতকী হতে হবে।

নাজাত বা মুক্তি প্রাপ্ত জামাত কোন্‌টি

আমরা বাহাত্তোর ফির্কা এবং তাদের ফতোয়াবাজী দেখলাম। ফতোয়ার ধারা এখনও বন্ধ হয়নি। নিত্য নূতন ফতোয়া পত্র-পত্রিকা এবং বই পুস্তকে প্রকাশিত হচ্ছে। এমন কি ফতোয়ার দৌড় এখন কাঁথা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। জনৈক মৌলবী সাহেব মেয়েদের কাপড় দিয়ে তৈরী কাঁথা পরপুরুষের জন্য ব্যবহার করা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন (বাংলার বাণী ৮/১/৯০)।

প্রশ্ন জাগে, ৭৩ দলের মধ্যে ৭২ ফির্কার কথাতো আমরা জানলাম। তাদের দলাদলি এবং ফতোয়াবাজীও আমরা শুনলাম। তাহলে সেই একটি জামাত কোথায় যাকে মহানবী (সাঃ) জান্নাতি বলে আখ্যা দিয়ে গেছেন ? এর উত্তরে হয়ত প্রতিটি ফির্কাই দাবী করবে যে, একমাত্র তার দলটিই সেই সৌভাগ্যবান নাজী বা মুক্তি প্রাপ্ত দল। কারণ নিজের দলকে নারী বা জাহান্নামী মনে করলে কেউই সেই দলে থাকতে পারে না। নিজ দলকে খাঁটি এবং আদি, অকৃত্রিম, মৌল দল মনে করেই সবাই আত্মতৃপ্তি লাভ করছে। আল্লাহ্‌তালা বলেন, "প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মীয় মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট আছে" (মুমিনূন, ৫৪ আয়াত)।

মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন,–সাতাফ তারিকু হাজিহিল উম্মাতু আলা সালাসিন ওয়া সাবয়ীনা ফির্কাতান কুল্লুহা ফিন্নার ইল্লা ওয়াহিদাতান–অর্থাৎ ৭৩ দলে বিভক্ত উম্মত উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ৭২ দল দোযখী হবে, শুধু একটি মাত্র দল জান্নাতী হবে। আরবের মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব, যাঁকে মোজাদ্দিদ রূপে মান্য করা হয়, বলেছেন,–" ৭৩ ফির্কার মধ্যে ৭২ দোযখী আর একটি বেহেশ্‌তি হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে পারে সে ফকিহ এবং যে এর উপর আমল করে–অর্থাৎ–৭২

ফির্কাকে প্রকৃতপক্ষে দোযখী এবং একটি জান্নাতীরূপে মানে শুধু সে-ই মুসলমান (মুখতাসর সিরাত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ১৩, ১৪ পৃঃ)। মহানবী (সাঃ) জান্নাতী দলটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ঐ দলটি–মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী–অর্থাৎ রসূল করীমের (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত জামাত হবে ঐ দলটি। ৭২ দলের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক নেতা বা খলীফা নেই। মহানবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পর সাহাবীরা যে বিষয়ের উপর আমল করেছিলেন তা হল, খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত বা নবুওয়তের পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের আনুগত্য। অতএব মুক্তি–প্রাপ্ত দলটির মধ্যে অবশ্যই একজন ওয়াজিবুল এতায়াত খলীফা থাকবেন, বর্তমানে একটি মাত্র দল আছে যার নাম আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যাদের মধ্যে একজন আন্তর্জাতিক নেতা অর্থাৎ খলীফা রয়েছেন। ইসমাঈলীয়দের একজন নেতা আছেন 'হাজের ইমাম', কিন্তু এই নেতাকে তারা খলীফা বলেন না। খিলাফত আল্লাহ্‌র ওয়াদা (সূরা নূর) এবং নবীর স্থলাভিষিক্ত। মহানবীর (সাঃ) পর খোলাফায়ে রাশেদীনই ছিলেন উম্মতে মোহাম্মদীয়ার একমাত্র কাণ্ডারী। যারা এই খিলাফতকে মান্য করে তারাই সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সাঃ) বলেছেন,–আলাইকুম বি সুন্নাতি ওয়া সুন্নাতিল খোলাফায়ে রাশেদীনাল মাহদীনা–অর্থাৎ আমার সুন্নতকে মান্য কর এবং সৎ পথ প্রাপ্ত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সন্নতকে মান্য কর। শেষ যুগে ইমাম মাহদী (আঃ) দ্বারা পুনরায় খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বাস করে যে, ইমাম মাহদীর (আঃ) আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর দ্বারা পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আহমদীয়া জামাতকে অন্যান্য মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে কুফরী ফতোয়া দিয়ে পৃথক করে দিয়েছে। অতএব, এই দলটি কি করে নাজাতপ্রাপ্ত একমাত্র জামাত হবে ? এর উত্তর এই যে, ৭২ দল একত্রিত হয়ে এই একটি মাত্র জামাতকে [যাদের মধ্যে খলীফা আছেন] পৃথক বা খারিজ করে দেয়ায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই জামাতটি ৭৩ দলের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসা একটি দল। ৭২ দল এর বিরুদ্ধে। অর্থাৎ ৭২ দল একদিকে আর একটি দল অপর দিকে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই

দলটি তো অতি ক্ষুদ্র একটি দল। একশত কোটি মুসলমানের মধ্যে এরা মাত্র দুই কোটি। এর উত্তরে মহানবীর (সাঃ) একটি বাণীকে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন,-

বাদায়াল ইসলামু গারীবান ওয়া সায়া উদু গারীবান কামা বাদায়া ফাতুবালি গুরাবায়ী। অর্থাৎ ইসলামের শুরু হয়েছিল অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে আর শেষেও অল্প সংখ্যক লোক হবে। ঐ অল্প সংখ্যকই ধন্য। সংখ্যায় বেশী হলেই কেউ সত্য পথ প্রাপ্ত হয়ে যায় যায় না। বর্তমানে মুসলমানদের চাইতে অমুসলমান প্রায় ছয় গুণ বেশী। পবিত্র কোরআন বলে,-অধিকাংশ লোকের কথা মত চললে আল্লাহ্‌র পথ (ইসলাম) থেকে ভ্রষ্ট হতে হবে (আনআম, ১১৭ আয়াত)। তাই জগতের সকলে সত্যকে মিথ্যা বললেও সত্য সত্যই। আর দুনিয়ার সকলে মিলে মিথ্যাকে সত্য বললেও মিথ্যা সত্য হয়ে যাবে না।

ইমাম আলী কারী (রহঃ) মিশকাতের শরাহ মিরকাতে লিখে গেছেন,-৭৩ ফির্কার মধ্যে আহলে সুন্নত জামাতের একমাত্র মুক্তি প্রাপ্ত দলটির নাম হবে আহমদীয়া (জিল্‌দ, ১, পৃঃ ২৪৮)।

তিনি বলেছেন,-ওয়াততারিকাতুন নাজিয়াতুল আহমদীয়া। আর এই আহমদীয়া জামাতকে ৭২ দল একত্রিত হয়ে ফতোয়া দিয়ে পৃথক করে দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, এই দলটিই সেই সৌভাগ্যবান জামাত যার সম্বন্ধে মহানবী (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এখন ৭২ দল একত্রিত হয়ে এবং আহমদী জামাতকে পৃথক করে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারাই হল-ওয়া সাবয়ীনা মিল্লাতা-এবং অপরটি সেই প্রতিশ্রুত ওয়াহেদ জামাত।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত তাদের খলীফার নেতৃত্বে পৃথিবীর একশত পঞ্চান্নটি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। প্রায় ছয় হাজারের অধিক শাখা রয়েছে এই জামাতের। বহু ভাষায় কোরআন হাদীস অনুবাদ করে শত ভাষায় ইসলামী পুস্তক প্রকাশ করে, দেশে দেশে মসজিদ, মিশন স্থাপন করে, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে এই জামাত সত্যকে প্রচার করে চলেছে। এই জামাত পীরতন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। এই জামাতের রীতি ও নীতি হল বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) প্রদর্শিত ও আচরিত মত ও পথ। সাহাবীদের আদর্শে নিজদিগকে উৎসর্গ করে এক নেতার অধীনে এই

জামাত ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলেছে। শত বাঁধা, শত ফতোয়া-এর অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে পারে নি। এই জামাতের খলীফার খুতবা আজ উপগ্রহের মাধ্যমে ডিস এন্টিনার দ্বারা পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে প্রচারিত হয়। শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই সংঘবদ্ধ, সুশৃঙ্খল। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক বলেছিলেন, –"একমাত্র আহমদী সম্প্রদায় ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক বর্তমানে উল্লেখযোগ্যরূপে ইসলাম প্রচারে মনোযোগী ও তৎপর কিনা বলিতে পারি না" (শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, ৩৪ পৃঃ)। হ্যাঁ, একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার করে অগণিত মানুষকে ইসলামের পতাকা তলে একত্রিত করছে। অপরদিকে বাহাত্তোর দল একে অপরকে কুফরী ফতোয়া প্রদান করে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ করে দিচ্ছে। ইসলাম এসেছিল বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করতে। কিন্তু আফসোস ! আজ মুসলমানরা পরস্পর ফতোয়াবাজী করে নিজেরাই, ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে এহেন অবস্থা থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

নূতন ফতোয়া

আলেমরা যুগে যুগে এত ফতোয়া দিয়েছেন যে, আজ আর সাধারণ মানুষ সহজে তাদের ফতোয়াকে মূল্য দেয় না। তাই আলেমরা এখন সরকারের দ্বারা ফতোয়া প্রদান করাতে চান। তাদের ফতোয়ায় কোন কাজ হয়নি দেখে তারা সরকারী ফতোয়া চান। কিন্তু প্রশ্ন হল, আলেমদের ফতোয়ায় যদি কোন কাজ না হয়ে থাকে তাহলে কি সরকারী ফতোয়ায় কোন কাজ হবে ?

পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদেরকে সরকারীভাবে কাফের ফতোয়া দিয়েছিল। কিন্তু তাতে অত্যাচার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া কি কোন লাভ হয়েছে ? না, ভুট্টো-জিয়ার সরকারী ফতোয়ার পর এই জামাত আরো বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। উন্নতি করেছে সকল ক্ষেত্রে, ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে। ফতোয়াদানকারী–ভুট্টো–জিয়া খোদার গজবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ওরা নেই, আহমদীয়ত আছে।

সরকার বা কোন সংসদ কি ফতোয়া দিতে পারে ?

সকল ধর্মের লোক দ্বারা নির্বাচিত সকল মত ও পথের লোক দ্বারা গঠিত সংসদ কি কাউকে অমুসলমান ঘোষণা করতে পারে ? আলেমদের দ্বারা নাজায়েয ফতোয়া প্রাপ্ত নারী নেতৃত্ব কি কোন ফতোয়া দিতে পারে ? সংসদের ফতোয়ায় যদি কেউ অমুসলমান হয়ে যায়, তাহলে কি তাদের ফতোয়া দ্বারা অমুসলমানরা মুসলমান হয়ে যাবে ? নানা ধর্মে এবং মতবাদে বিশ্বাসী সাংসদরা কি শরীয়ত অনুযায়ী ফতোয়া দেবার যোগ্য ? সাংসদের সবাই কি শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করেন ? তাঁরা কি শুধু মুসলমানদের ভোটে নির্বাচিত ? যাদেরকে তারা অমুসলমান ঘোষণা দিবেন তাদের ভোটে কি ঐ সব সাংসদ নির্বাচিত হন কি ? শুধু মুসলমানের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ইসলামী বিধান পূর্ণরূপে পালন করেও কেউ কাউকে অমুসলমান বানাতে পারে না।

মুসলমান কে ?

আরবের কিছু সংখ্যক বেদুঈন হযরত (সাঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাস করার দাবী করলেন। এর উত্তরে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, (হে মোহাম্মদ !) তাদেরকে বল, তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। কারণ, (এখনও) ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি; (হুজুরাত ঃ ১৫)।

একবার মুসলমানের পরিচয় দিতে গিয়ে হযরত (সাঃ) বলেন ঃ যে আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলামুখী (হয়ে নামায পড়ে), এবং আমাদের যবাই করা প্রাণীর মাংস খায় সে-ই মুসলমান, যার জিম্মা খোদা এবং তাঁর রসূল (সাঃ) নিয়েছেন। সুতরাং খোদার জিম্মাদারী পালনে তোমরা হস্তক্ষেপ করো না (বোখারী কিতাবুস্ সালাত)।

একবার মদীনাতে আদম শুমারীর প্রাক্কালে হযরত (সাঃ) বলেন ঃ

মানুষের মধ্য হতে যে নিজে মুসলমান হওয়ার দাবী করে তাকে আমার জন্যে তালিকাভুক্ত করে নাও।

হযরত ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ে তাকে আমরা কাফের বলতে পারি না।' হযরত উসামা বিন যাইদ এক বিধর্মীর সাথে যুদ্ধ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বিধর্মীকে কাবু করে ফেলেন। তখন সেই বিধর্মী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করে, তা সত্ত্বেও তিনি তাকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে তিনি ঘটনাটি হুযুর (সাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে হযুর (সাঃ) খুব ব্যথিত হন। তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়া সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করলে ? উসামা উত্তর দিলেন 'সে মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পড়েছিল।' তখন হুযুর (সাঃ) বল্লেন, 'তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছ?' আর এই কথা হুযুর (সাঃ) বার বার বলতে থাকলেন। হুযুরের (সাঃ) এই অবস্থা দেখে ওসামা (রাঃ) বলেন "হায় ! যদি আমি এর আগে মুসলমান না হতাম তা হলেই ভাল হতো" (মুসলিম কিতাবুল ঈমান)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর 'আইয়ামুস্ সুলেহ্' পুস্তকে বলেছেন ঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নিধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযূর্গানের ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়িন"

অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।

মৌলবাদী ইসলাম ও মৌলিক ইসলাম

সম্প্রতি সমগ্র বিশ্বে মৌলবাদীদের তৎপরতায় ইসলামের যে রূপটি জগদ্বাসীর সম্মুখে প্রকটভাবে ধরা পড়েছে তা কোন মতেই মৌলিক ইসলাম নয়। মহানবীর (সাঃ) জীবনাদর্শ, আচরণ এবং বচনের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই।

যারা মৌলবাদীরূপে পরিচিত তাদের মূলের সংগে কোন পরিচয় নেই। মূলকে বাদ দিয়েই তারা মৌলবাদী।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন, সমগ্র বিশ্বের জন্য আশিস বা কল্যাণ। প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং সেবার

মাধ্যমে তিনি মানুষের অন্তর জয় করেছেন। ক্ষমা করেছেন জঘন্য, পাষণ্ড, নরাধম, পশুতুল্য শত্রুদেরকে। ফলে ঐ পশুরা শুধু, মানুষেই পরিণত হয়নি তারা হয়েছে খোদা-প্রাপ্ত মানুষ। তিনি ছিলেন 'পরশমণি' তুল্য। তাঁর সংস্পর্শে যে-ই এসেছে সে পরিণত হয়েছে সোনার মানুষে। অসভ্য, বর্বর, নরপিশাচ, পশুবৎ মানবাকৃতির জীবগুলো খাঁটি মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর পবিত্র পরশে।

আজ সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, যেখানে মৌলবাদীরা সংখ্যায় বেশী সেখানেই অশান্তি হানাহানি রক্তপাত। মিশর, আলজিরিয়া, সুদান প্রভৃতি দেশে মৌলবাদীরা সংঘাতে লিপ্ত। প্রতিষ্ঠিত সরকার তাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ। আফগানিস্তানে মৌলবাদী মুসলমানেরা পরস্পর লড়ছে, মরছে অনবরত। পাকিস্তানে একদল অপর দলের মসজিদে বোমা নিক্ষেপ করছে। হত্যা করছে কুরআন পাঠরত শিশুদেরকে। এক মৌলবী তার স্ত্রীর গোপনাঙ্গে তপ্ত লোহার রড ঢুকিয়ে দিয়েছে। এক পিতা তার দুই কন্যা সন্তানকে ধর্ষণ করেছে। এক ধর্মীয় নেতা মৌলানা যিনার অপরাধে ইসলামী সংগঠনের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। অপরদিকে কুরআন জ্বালাবার মিথ্যা অপরাধে এক ব্যক্তিকে মৌলবীরা জ্বালিয়ে হত্যা করে লাশটি মোটর সাইকেলের সংগে বেঁধে সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী বেনজীরের বান্ধবী ফারহানাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। এই নির্দয়, নিষ্ঠুর, অশ্লীল অমানবিক কর্মস্থলের নাম 'ইসলামী রাষ্ট্র' রেখেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে এক নারীবাদী লেখিকার অবাঞ্ছিত লেখাকে কেন্দ্র করে মৌলবাদীরা চীৎকার শুরু করেছে। হত্যা, ফাঁসীর দাবী জানাচ্ছে। এক মৌলবী ঐ লেখিকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। কারণ মৌলবীর মতে 'হেদায়াত' করতে হলে বিয়ে করতে হবে। একান্ত কাছে না পেলে হেদায়াত করা যাবে না। কারণ এসব তথাকথিত মৌলবী-মোল্লারা ওয়াজ নসিহত করে, দলিল-প্রমাণ আর যুক্তি দিয়ে তো কাউকে হেদায়াত করতে পারে না। তারা পারে ফতোয়া দিয়ে মুসলমানকে অমুসলমান বানাতে, যিনার অপরাধে ইহুদী বিধান অনুযায়ী পাথর মেরে সংগেসার করতে। খৃষ্টানদের কাছে থেকে ধার করে আনা ব্লাসফেমী আইন চালু করে মানুষকে হত্যা করে এবং মোরতাদ আখ্যা দিয়ে বিপক্ষকে মৃত্যুদণ্ড দিতে এরা এক্সপার্ট। দলিল-প্রমাণ, যুক্তি

এদের হাতে নেই, এদের হাতে আছে শুধু তরবারি। তরবারি আর কলেমাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে ওরা। এরা শক্তিশালী বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে না, করতে পারে না। এরা জেহাদ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। দুর্বলের বিরুদ্ধে এরা জেহাদ করতে বেশী আগ্রহী। কারণ দুর্বল শান্তিপ্রিয় মানুষের বিরুদ্ধে জেহাদ করলে শহীদ হওয়ার ভয় থাকে না। এরা অযোদ্ধায় যাবার জন্য লংমার্চ করে নিজ দেশের ভিতরে। এরা ইসলাম কায়েমের জন্য হরতাল করে, লংমার্চ করে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে। অমুসলমানরা আজ ইসলামের এই ভয়াবহ রূপ দেখে ভীত, সন্ত্রস্ত্র। ইসলামের নাম শুনলে ওরা আঁৎকে উঠে। মধ্যরাতে'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি শুনলে ওদের ঘুম হারাম হয়ে যায়। মায়েরা তাদের শিশু-সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে অজানা আশংকায়। মৌলবাদীদের ক্রিয়া, কর্ম-কাণ্ড দেখে দেশে-বিদেশে অসংখ্য মানুষ ইসলাম সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অন্তরায়।

মৌলবাদীদের হাত থেকে পবিত্র ইসলামকে রক্ষা করতে হলে ইসলামের আসল এবং অকৃত্রিমরূপকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। মোল্লা–মৌলবীদের অসুন্দর, কুৎসিত, জঘন্য কাজগুলো যে ইসলাম নয়, তা উদ্‌ঘাটন করে দেখাতে হবে। পবিত্র কোরআন ও মহানবীর (সাঃ) প্রকৃত শিক্ষাকে জগৎ ময় প্রচার করতে হবে। প্রকৃত মুসলমানদেরকে জাতি-ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে প্রেম–প্রীতি, সেবা, সমর্থন দিয়ে, অভয় দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, নিরাপত্তা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের কাছে কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা, মহানবীর (সাঃ) জীবন ও আদর্শকে উপস্থাপন করে বলতে হবে মৌলবাদী ইসলাম ও মৌলিক ইসলাম এক নয়। মৌলবাদীরা আসল নয় নকল ইসলাম নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। অতএব, নকল হতে সাবধান !

মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, লামইয়াবকামিনাল ইসলামে ইল্লা ইসমুহূ। অর্থাৎ এমন সময় আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আজ যেসব মৌলবাদী ইসলাম ইসলাম করছে তারা ইসলামের নাম ছাড়া ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে উচ্চারণ করছে না। নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, লাম ইয়াবকামিনাল কোরআনে ইল্লা রাসমুহূ। অর্থাৎ কোরআন থাকবে অক্ষরে তবে তার শিক্ষা থাকবে না। কত সত্য এই অমৃত বাণী !

মৌলবাদীরা কোরআন দিবস পালন করছে অথচ কোরআনের শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ইহূদী খৃষ্টানী আইনকে চালু করতে চাইছে। রসূল করীম (সাঃ) বলেছিলেন, মাসাজিদুহুম আমেরাতুন, ওয়াহিয়া খারাবুম্ মিনাল হুদা। অর্থাৎ বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করা হবে, তবে সেখানে কোন সৎ পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন, উলামাউহুম শাররুমান তাহ্তা আদিমিস সামায়ী মিনইনদিহীম তাখরুজুল ফিৎনাত ওয়া ফিহিম তাউদ। অর্থাৎ নামে মাত্র ইসলামের, কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থানকারী বড় বড় মসজিদের দখলদার খতীব, ইমাম ও উলামারা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হবে। এরা ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে, পরিণামে ওরাই ঐ ফেৎনায় নিক্ষিপ্ত হবে। কত বাস্তব, কত সত্য এই মহাবাণী, ভবিষ্যদ্বাণী। আজ কি কেউ এই সত্যতে অস্বীকার করতে পারে? শ্রেষ্ঠ নবীর (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী কখনো ব্যর্থ হতে পারে না, মিথ্যা হতে পারে না। মহানবী (সাঃ) যাদেরকে সকল জীবের চাইতে নিকৃষ্ট বলেছেন তাদের কাছে তো কোন কল্যাণ আশা করা যায় না ? পবিত্র কুরআন বলে, উলাইকা কাল আনআম বালহুম আযাল্লু অর্থাৎ এরা পশুর চাইতে অধম।

ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, (১) ইসলাম নাম ব্যবহার করলেও তা প্রকৃত ইসলাম ধর্ম নয়। দেশের নামে, রাষ্ট্রের নামে, ইসলাম যুক্ত তা ইসলাম হবে না। (২) কুরআনের দোহাই দিলেও তা কুরআনের শিক্ষা নয়। ইসলামী প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্র ধর্ম, ব্লাসফেমি, সংগেসার প্রভৃতির কথা কুরআনের নেই। পবিত্র কুরআন থেকে কেউ একটি আয়াতও দেখাতে পারবে না যাতে মুরতাদের শাস্তি মৃতুদণ্ড এবং যিনার শাস্তি পাথর মেরে হত্যার কথা আছে। (৩) বড় বড় মসজিদ নির্মিত হয়েছে কিন্তু তাতে প্রকৃত হেদায়াত নেই। মানুষ সেখানে পথের সন্ধান পায় না। মসজিদের পাশে রাজনীতির বাজার গরম হয়, একে অপরের কুৎসা গায় মিম্বরে উঠে। (৪) আলেমরা নিকৃষ্ট অধম জীবে পরিণত হবে। এটি মহানবীর (সাঃ) বাণী, যা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। অপর এক হাদীসে আছে, তাকুনু ফি উম্মাতি ফাজআতুন ফাইয়াসিরুন্নাসু ইলা উলামায়ীহিম ফাইজাহুম কিরাদাতুন ওয়া খানাজিরা (কঞ্জুল উম্মাল, ৭/১৯০ পৃঃ) অর্থাৎ আলেম সমাজ বানর ও শূকরে পরিণত হবে (তৌবা, তৌবা ! কথাগুলো আমাদের ছোট মুখের নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ

নবীর)। (৫) পূর্ববর্তী হাদীসে বলা হয়েছিল, আলেমরা ফেৎনা সৃষ্টি করবে এবং তারাই ঐ ফেৎনায় আবর্তিত হবে। আজ কথায় কথায় ফতোয়া, কথায় কথায় কাফের, মুরতাদ, কথায় কথায় হত্যা, কতল প্রচার করা হচ্ছে। অথচ এরাই একে অপরের সঙ্গে মারামারি করে মরছে। আফগানিস্থানে মোল্লারা একসংগে লড়েছে কমিউনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে (মজার ব্যাপার ঐ কমিউনিষ্ট সরকারও রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করেছিল)। ক্ষমতা লাভের পর এখন পরস্পর লড়াই করে মরছে। খোদানাখাস্তা, বাংলাদেশে যদি তথাকথিত ইসলামী আইন চালু হয় তাহলে ইসলামের নামে আন্দোলনকারীরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে আফগানিস্থানের ন্যায় লড়াই করে মরবে। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে ২৯শে জুলাই তারিখে। মৌলবাদীরা একই দাবী নিয়ে দুই জায়গায় সমাবেশ করেছে। একদল করেছে মানিক মিয়া এভিনিউতে অপর দল বায়তুল মোকার্‌রমে। ক্ষমতা হাতে আসলে এই দুইদল জেহাদ করবে একে অপরের বিরুদ্ধে। এসব কথা অনুমান করে বলছি না, ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বলছি। একদলে থাকবে পীর-পন্থীরা অপরদিকে ওহাবী-মৌদুদীরা। তবে পীরে পীরে লড়াই হতে পারে, ওহাবী-মৌলবাদী পন্থীদের মধ্যেও লড়াই হতে পারে। কারণ এদের মধ্যেও ইখতিলাফ রয়েছে প্রচুর। জেহাদ শুরু হয়ে যেতে পারে বেরেলবী ও দেওবন্দীদের মধ্যে কারণ এরা একে অপরকে কাফের জ্ঞান করে থাকে। অতএব দেশবাসী সাবধান, হুঁশিয়ার !

হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন। সকল সৃষ্টির জন্য রহমত বা কল্যাণ-স্বরূপ। তিনি ছিলেন দয়ার সাগর, ক্ষমার মূর্তিমান রূপ। তাঁর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম ইসলাম প্রকৃতিসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত জীবন বিধান এই ধর্ম শান্তির ধর্ম।

ইসলাম বলে, ওয়া কুলিল হাক্কু মির রাব্বিকুম ফামান শায়া ফাল ইউমিন ওয়ামান শায়া ফাল ইয়াকফুর--অর্থাৎ, এই সত্য-ধর্ম বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগত, যার ইচ্ছা হয় এই ধর্মকে গ্রহণ করবে আর যার ইচ্ছা হয় অস্বীকার করবে। কেননা, লা-ইকরাহা ফিদ্দীন--ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। ফাবুদুমা শিতুম মিন দুনিহী, অর্থাৎ যদি কেউ চায় তাহলে সত্য খোদাকে বাদ দিয়ে তার ইচ্ছামত অন্য কাউকে পুজা করতে পারে। মহানবীকে (সাঃ) ধর্ম রক্ষার জন্য দারোগা করে পাঠান হয়নি। লাসতা

আলাইহিম বিমুসায়তির। পবিত্র কোরআন বলে, ওয়ামাই ইয়ারতাদমিনকুম--তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ইসলাম ত্যাগ করে বা মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে উলাইকা আসহাবুন্নার--অর্থাৎ সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জাগতিক কোন শাস্তি নয়, মুরতাদের শাস্তি জাহান্নাম। মুরতাদ হওয়ার কারণে মহানবী (সাঃ) কাউকেই শাস্তি দেননি। কারণ মুরতাদ হয়ে যাবার পর পুনরায় সে ইসলামে ফিরে আসতে পারে। সুম্মা আমানু সুম্মা কাফারু। মহানবীর (সাঃ) এক ওহী লেখক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর ঐ ব্যক্তি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই ব্যক্তি ওমর (রাঃ) ও উসমানের (রাঃ) খিলাফতকালে উচ্চপদ লাভ করে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

ধর্ম নিন্দা বা রসূল নিন্দার কারণেও কাউকে শাস্তি দেয়া হয় নি। এক ব্যক্তি মহানবীকে (সাঃ) মোজাম্মম বলত। উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বলতেন, "মোহাম্মদ বা প্রশংসিত কখনও মোজাম্মম বা নিন্দিত হতে পারে না।" ইহুদীরা তাঁকে সালামের পরিবর্তে 'আস্‌সাম আলাইকা' বলত। এর অর্থ তোমার মৃত্যু হোক। কিন্তু এজন্য কোন শাস্তি দেয়া হয় নি।

নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) ও মারিয়ার (রাঃ) চরিত্রে জঘন্য অপবাদ দেয়া হয়েছে। তবুও নবী করীম (সাঃ) অপবাদকারীদেরকে কখনও মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন নি। আবদুল্লাহ বিন উবাইবিন সলুল মহানবীকে (সাঃ) মদীনার নিকৃষ্টতম ব্যক্তি বলেছিল। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাকে শাস্তি তো দিলেনই না বরং নিজের কাপড় দিয়ে তার কাফন দিলেন, তার জানাযা পড়লেন। খায়বারে নবী আকরমকে (সাঃ) যে ইহুদী রমণী বিষ দিয়েছিল তিনি তাকেও ক্ষমা করে দেন। ঘোষণা করেন, নারী হত্যা নিষিদ্ধ (বোখারী)। এক ব্যক্তি তাঁকে একা পেয়ে তরবারি দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। এক বুড়ি তাঁর রাস্তায় কাঁটা দিত, সেই বুড়ি যখন অসুস্থ তখন তিনি তাকে দেখতে যান। এক ব্যক্তি মদীনার মসজিদে প্রস্রাব করছিল। সাহাবীরা ধর-মার বলে এগিয়ে গেলেন। মহানবী (সাঃ) ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে বল্লেন, "থাম, থাম, ওকে প্রস্রাব করতে দাও। হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।" তাঁর (সাঃ) ঘরে রাতে এক ব্যক্তি মল ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। সে তার তরবারিটি ফেলে গিয়েছিল, তাই ওটি নিতে এসে দেখে বিশ্বনবী (সাঃ) তার মল পরিষ্কার করছেন।

এক বুড়ি তার মাল-পত্র নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। মহানবী (সাঃ) দেখলেন, বৃদ্ধা মহিলাটি তার মাল-পত্র ঠিক মত বহন করতে পারছে না। তিনি এগিয়ে এসে বল্লেন, "আমাকে দাও, তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেই।" পৌঁছে দেয়ার পর বুড়ি বলল, "বাবা, তুমি খুবই ভাল মানুষ। সাবধান থাকবে মোহাম্মদ নামক ব্যক্তিটি থেকে। কারণ ঐ মোহাম্মদ আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম নষ্ট করে ফেলছে।" মহানবী (সাঃ) বললেন, "ভয় নেই, আমিই সেই মোহাম্মদ।"

মক্কা বিজয়ের পর তিনি হিন্দাকে ক্ষমা করলেন, যে হিন্দা হামজার (রাঃ) কলিজা চর্বণ করেছিল। সাহাবীদের নাক, কান কেটে গলায় মালা পরেছিল। ওয়াশীকে ক্ষমা করলেন, যে তাঁর প্রিয় চাচাকে হত্যা করেছিল। তাঁর কন্যা জয়নাবের (রাঃ) ঘাতক হাব্বাবকেও ক্ষমা করলেন।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সব চাইতে পবিত্র। এই অস্তিত্বকে বাদ দিলে ধর্ম থাকে না। অথচ বহুলোক এই মহা অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। এমনকি গাল মন্দ পর্যন্ত দিয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও শান্তির ধর্ম ইসলাম এজন্য কোন শাস্তির বিধান দেয় নি। পবিত্র কোরআন বলে, লাতাসুব্‌বুল্লাযীনা ইয়াদউনা মিনদুনিল্লাহে ফা ইয়াসুব্‌বুল্লাহা আদওয়াম বেগায়রে ইলমিন। অর্থাৎ, তোমরা মূর্তি বা কল্পিত উপাস্যদেরকে গালি দিও না তাহলে অজ্ঞতাবশতঃ ঐ সবের পূজারীরাও আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। মৌলবাদীদের মতে আল্লাহ্‌কে গালি দিলে তো গর্দান উড়িয়ে দেয়ার কথা, জিহ্বা কেটে ফেলার কথা। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা এই জন্য কোন শাস্তি তো দূরের কথা বরং মুসলমানরা অন্যের উপাস্যকে গালি দিলে অন্যেরাও মুসলমানদের উপাস্য সত্য-খোদাকে গালি দিবার অধিকার লাভ করবে বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। আল্লাহ্‌র পুত্র আছে বলা একটি ভয়ানক অপরাধ। তাকাদুস সামাওয়াতু ইয়াতা ফাত্তারনা মিনহু ওয়া তান শাক্কুল আরজু ওয়া তাখিরুল জিবালু হাদ্দা। অর্থাৎ --এহেন কথার জন্য আকাশ ফেটে যেতে চায়, পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায় এবং পর্বতমালা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতে চায়। অথচ এই ভয়ানক মিথ্যা বলার জন্য কোন জাগতিক শাস্তির ব্যবস্থা নেই।

আল্লাহ্‌র পর নবীদের মর্যাদা সব চাইতে বেশী। অথচ কুরআন বলে, ইয়াহাসরাতান আলাল ইবাদ মা ইয়াতিহিম মির্‌রুসুলীন ইল্লা কানু বিহি ইয়াস তাহ্‌জিউন। অর্থাৎ –হায় আফসোস ! এমন কোন নবী আসেননি যাকে নিয়ে মানুষ বিদ্রূপ না করেছে। অথচ এজন্য কোন জাগতিক শাস্তির বিধান নেই। মহানবীকে (সাঃ) পাগল, কবি, যাদুকর বলেছে লোকে, অথচ এজন্য কোন শাস্তির উল্লেখ নেই। মহানবীকে (সাঃ) হত্যা করতে চেয়েছে, বয়কট করেছে, দৈহিক নির্যাতন করেছে। এর পরও ঘোষণা দেয়া হচ্ছে, খুজিল আফওয়া ওয়ামুর বিল উরফে ওয়া আরিজ আনিল জাহেলীন। অর্থাৎ ক্ষমা কর, এবং প্রকৃতিসম্মত বাক্য দ্বারা উপদেশ দাও, আর অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল। অত্যাচার, অবিচার, যুলুম এবং আঘাত সহ্য করতে না পেরে সাহাবারা বল্লেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ আর সহ্য করতে পারছি না। হুকুম দিন মরবার আগে একবার অস্ত্র ধরি। মহানবী (সাঃ) বল্লেন, ইন্নি উমিরতু বিল আফু ফালা তুকাতেলু। অর্থাৎ--আমাকে ক্ষমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের আদেশ নয়।

মক্কা বিজয় কালে সেনাপতি ছিলেন সায়াদ (রাঃ)। ইনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে কবিতা পাঠ করতে লাগলেন,--

আল্ ইয়াওমু ইয়ামু মুলহিমাতিন,

আলইয়াওমা তাসতাহিল্লুল কাবাতি।

অর্থাৎ--আজ প্রতিশোধ নেবার দিন। আজ কাবাতেও যুদ্ধ করা সিদ্ধ।

মহানবী (সাঃ) যখন একথা শুনলেন তখন সায়াদকে (রাঃ) পদচ্যুত করলেন এবং তদস্থলে তাঁর পুত্র কায়েসকে (রাঃ) সেনাপতি নিয়োগ করে বল্লেন, বল, আল ইয়াওমু ইয়ামু মারহামাতিন। অর্থাৎ আজ রহম ও দয়া করার দিন। কী অপূর্ব এই দৃশ্য ! মক্কায় প্রবেশ করে ঘোষণা করলেন, লাতাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা। অর্থাৎ আজ কোন প্রতিশোধ নয়। শুধু ক্ষমা আর ক্ষমা। এক বুড়ি থর থর করে কাঁপছে। দয়াল নবী (সাঃ) তার হাত ধরে অভয় দিয়ে বল্লেন, "কাঁপছো কেন ? আমি তো তোমারই মত এক কোরেশ নারীর সন্তান।"

হত্যার অপরাধে, যুদ্ধের অপরাধে যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল তাদেরকেও একে একে মাফ করে দিলেন। ক্ষমাপ্রাপ্ত আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমা একদিন নবী করীমকে (সাঃ) এসে বল্লেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, মানুষ আমার পিতা আবূ জাহলকে মন্দ বলে তাতে আমার খারাপ লাগে। দয়ার সাগর ক্ষমার মূর্তিমান রূপ (সাঃ) বললেন, "মৃত ব্যক্তিকে গালি দিয়ে জীবিতকে কষ্ট দিও না।"

হে মৌলবাদীরা, ইনি হলেন আমাদের নবী, বিশ্বনবী, শ্রেষ্ঠ নবী, রৌফ ও রাহীম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা (সাঃ)।

ইসলামের পরিভাষা

ইদানীং মৌলবী সাহেবরা তাদের ওয়াজ ও খুতবায় দাবী জানিয়ে আসছেন যে, তারা যাদেরকে কাফের মনে করেন তারা 'ইসলামী পরিভাষা' অর্থাৎ–নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, মসজিদ, আল্লাহ্, রসূল, এবাদত, বিসমিল্লাহ, ইনশাল্লাহ, সালাম ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। এই সব শব্দ ব্যবহার করতে কেবল মুসলমানদেরই একচেটিয়া অধিকার রয়েছে, অন্য কারো নয়।

আরবী ভাষা বর্তমানে মরোক্কো, আলজেরীয়া, তিউনেশিয়া, সুদান, মিশর, লিবিয়া, সৌদী আরব, ইরাক, কুয়েত, সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, বাহরাইন, ইয়েমেন, ওমান, কাতার, ফিলিস্তিন সহ আফ্রিকা ও এশিয়ার আরো বেশ কিছু অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় এবং কথিত ভাষারূপে প্রচলিত। উল্লেখিত দেশগুলিতে শুধু মুসলমানরাই বাস করে না মুসলমান ছাড়াও ইহুদী এবং খৃষ্টানরাও ঐসব দেশে বাস করে থাকে। এই সব অঞ্চলে আরবীয় ইহুদী ও খুষ্টানের মাতৃভাষাও আরবী। মহানবীর (সাঃ) পূর্বেও তৎকালীন আরবের ইহুদী, খৃষ্টান এবং পৌত্তলিকরা এই আরবী ভাষা ব্যবহার করত। আরবী অক্ষর আবিষ্কার এবং আরবীতে কাব্য চর্চার প্রবর্তকরা সবাই ছিল অমুসলমান পৌত্তলিক।

যারা বলেন, নামায, রোযা শব্দ দু'টি ইসলামী পরিভাষা, তারা জেনেও জানেন না যে, এই দু'টি শব্দ ফার্সী। ফার্সী ভাষা ছিল অগ্নি উপাসকদের ভাষা। মৌজুসীরা তাদের প্রার্থনাকে বলত নামায। রোয শব্দ থেকে রোযা শব্দের উৎপত্তি। রোযা বা দিনব্যাপী যে ধর্মীয় ব্রত পালন করা হয় তাকেই বলে রোযা। নামায ও রোযার আরবী নাম, সালাত ও সৌম। সালাত ও সৌম শব্দ দু'টি আরবী বাইবেলেও ব্যবহৃত হয়েছে। ঈসা (আঃ) বলেছেন--ওয়াআম্মা হাজাল জিনসু ফালা ইয়াখরুজু ইল্লা বিস্ সালাতি ওয়াস্ সৌম (মথি, ১৭ঃ২১) অর্থাৎ--সালাত বা নামায এবং সৌম বা রোযা ব্যতীত মন্দ শক্তিকে দূর করা যায় না। রোযার কথা বাইবেলের যাত্রা, ৩৪ঃ২৮; নহমিয়, ১ঃ৪; ইষ্টের ৪ঃ১৬; যিশাইয়, ৫৮ঃ৪-৯, যিরমিয়, ৩৬ঃ৯; যোয়েল, ২ঃ১২-১৬; সখরিয়, ৭ঃ৫, ৮ঃ১৯, মথি, ৪ঃ২, ৬ঃ১৬ মার্ক, ২ঃ১৮, ২০, প্রেরিত, ১৩ঃ৩, ২৭ঃ৯ প্রভৃতি পুস্তকে রয়েছে। বাইবেল পাঠে জানা যায় যে, ইয়াকুবের (আঃ) এক পৌত্র ছিলেন হাজী (আদি, ৪৬ঃ১৬; গণনা, ২৬ঃ১৫)। ইবনে খলদুন লিখেছেন, প্রাচীন পারশ্যবাসীরাও হজ্জ করত (মোকাদ্দিমা, ১৯৩ পৃঃ)। হজ্জের প্রবর্তক ইব্রাহীম (আঃ) ইহুদী ও খৃষ্টানদেরও ধর্ম পিতা ছিলেন। মৌলবী সাহেবদেরকে জিজ্ঞেস করি, ইহুদী এবং খৃষ্টানরা যদি বলে, সালাত, সৌম, হজ্জ ইত্যাদি আমাদের ধর্মীয় পরিভাষা, এই ভাষা মুসলমানরা ব্যবহার করতে পারবে না। তখন আপনারা কী জবাব দিবেন ? ঈসার (আঃ) সালাত ও যাকাতের কথা পবিত্র কোরআনেও লিপিবদ্ধ আছে (সূরা মরিয়ম দ্রষ্টব্য)। পবিত্র কোরআনে আছে--কামাকুতিবা আলাল্লাযীনা মিন কাবলিকুম--অর্থাৎ রোযার বিধান নূতন কিছু নয়। পূর্ববর্তী সমাজেও রোযার বিধান ছিল (সূরা বাকারা)। এরপরও কি মোল্লা-মৌলবী সাহেবরা রোযাকে একমাত্র তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বলে দাবী করবেন ?

পবিত্র কোরআন বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়গুলিকে মসজিদ বলেছে (সূরা হাজ্জ)। মহানবী (সাঃ) ইহুদী খৃষ্টানদের তৈরী স্মৃতি সৌধগুলিকেও মসজিদ বলেছেন (বোখারী, মুসলিম, আহমদ প্রভৃতি)। মহানবী (সাঃ) সমগ্র পৃথিবীকেও মসজিদ বলেছেন (মেশকাত দ্রষ্টব্য)। মসজিদ অর্থ-যে স্থানে সেজদা করা হয়। পবিত্র কোরআনে আছে,--"যারা মসজিদে আল্লাহ্‌র নাম নিতে বাধা দেয় এবং মসজিদ ধ্বংস করে তাদের জন্য আছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা

ও পরকালে মহাশাস্তি (বাকারা)। শাহ আবদুল কাদের দেহলভী উক্ত আয়াতে মসজিদ বলতে ইসলাম-পূর্ব যুগের ইহুদীদের উপাসনালয় অর্থ করেছেন (আল্ কোরআনুল হাকিম, তাজ কোম্পানী, ২৩ পৃঃ)। এমন কি মৌদুদী সাহেব পর্যন্ত ইহুদী, খৃষ্টানদের উপাসনালয়কে মসজিদ বলেছেন (তফহীমুল কোরআন, ৭ খণ্ড, ২২৬, ২২৭ পৃঃ)। কিন্তু আজ মৌদুদী পন্থীরা তারা ছাড়া অন্য কেউ মসজিদ শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না বলে আবদার করছেন।

আল্লাহ্ নাম মহানবীর (সাঃ) পূর্বে পৌত্তলিকরা ব্যবহার করত। পৌত্তলিকরা আবদুল্লাহ্ নাম রাখত। এর অর্থ--আল্লাহ্র দাস। মৌলবী সাহেবদেরকে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ্কে যদি অন্যেরা আল্লাহ্ না বলে তাহলে তাঁকে কী বলে ডাকবে ? আপনারা বলছেন, রসূল শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। অথচ কোরআন শরীফে ফেরাউনের দূতকেও রসূল বলা হয়েছে (১২ঃ৫১)। সাবার রাণীর দূতদেরকেও রসূল বলা হয়েছে (২৭ঃ৩৬)। আরবী ও উর্দূ বাইবেলে ঈসার (আঃ) নামে প্রেরিতদেরকেও রসূল বলা হয়েছে (নূতন নিয়ম দ্রষ্টব্য) মুফতী শফি সাহেব তো বিবেক বুদ্ধিকেও রসূল বলেছেন (মা'রেফুল কোরআন, ৫ খণ্ড ৫১২ পৃঃ)। এবাদত শব্দটি অমুসলমান কাফেরদের উপাসনার জন্যও পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা কাফেরূন)। খতীব সাহেবদেরকে জিজ্ঞেস করি, আপনারা কি মহাগ্রন্থ কোরআনের বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করেছেন ? বিসমিল্লাহ্ বলার রেওয়াজ নূহ (আঃ) এবং সোলেমানের (আঃ) যুগেও চালু ছিল (কোরআন দ্রষ্টব্য)। বাইবেলে ইনশাআল্লাহ্ বলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে (যাকোব, ৪ঃ১৩-১৫)। সালাম বলার রীতি পূর্ব যুগেও ছিল (লূক, ১০ঃ৫)। ঈসা (আঃ) সালামুন্ লাকুম বলতেন (লূক, ২৪ঃ৩৬)। এখন যদি খৃষ্টানরা বলে যে, কোন মুসলমান আমাদের ধর্মগ্রন্থে স্বীকৃত পরিভাষা ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে এর কী জবাব হবে ? তবে আমাদের ধারণা খৃষ্টানরা অন্ততঃ মোল্লাদের মত এহেন অযৌক্তিক দাবী উত্থাপন করবে না।

মৌলবী সাহেবরা বলেন, আহমদীরা নিজেদেরকে মুসলিম বলতে পারবে না। অথচ পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ্তা'লা যারা ঈমান আনে নাই তাদেরকে মুসলিম বলেছেন (হুজুরাত, ১৫ আয়াত)। মহানবী (সাঃ) ৭৩ ফির্কার মধ্যে যে ৭২টি ফির্কা দোযখে যাবে তাদেরকেও তাঁর উম্মত

বলেছেন। তিনি তাফতারিকু উম্মতি বলে এদেরকে নিজ উম্মত বলেই স্বীকার করেছেন (মেশকাত দ্রষ্টব্য)। মোল্লা এবং আল্লাহ্‌র বিধানের একটা স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মহানবীকে (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লা পাঠিয়েছিলেন, অমুসলমানকে মুসলমান বানাতে। মোল্লা সাহেবরা নিজ দেশের অমুসলমানের কাছে ইসলামের বাণী নিয়ে যান না। তারা মুসলমানকে অমুসলমান করার জন্য মহাসম্মেলন করেন, মিসিল করেন।

আযান অতি পুরাতন শব্দ। বর্তমান আযান পদ্ধতি চালু হওয়ার পূর্বেও আযান শব্দ প্রচলিত ছিল। ওয়া আয্‌জিন ফিন্ নাস (কোরআন) বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইব্রাহীমের (আঃ) যুগেও আহ্বান জানাবার জন্য এই শব্দটির ব্যবহার হতো।

মৌলবী সাহেবরা যদি তাদের স্বীকৃত লোক ছাড়া অন্যদের জন্য আযান বন্ধ করে দেন তাহলে ফল কী দাঁড়াবে ? আযানে বলা হয়, আল্লাহ্ সর্ব শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ছাড়া আর উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল ইত্যাদি। এই সব সত্য কথা ঘোষণা করতে বারণ করার অর্থ কি এই নয় যে, তারা ছাড়া অপর কেহ আল্লাহ্‌কে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে মানবে না, আল্লাহ্ ছাড়া আরো উপাস্য আছে বলে বিশ্বাস করবে, মোহাম্মদকে (সাঃ) রসূল বলে স্বীকার করবে না ?

আপনারা জোশের সাথে যা বলছেন তা কি হুঁশের সাথেও বলছেন ?

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত কোন শব্দই নূতন নয়। ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেও এই সব শব্দ যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়েছে। আজ যেগুলিকে ইসলামী পরিভাষা বলা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে এগুলি ধর্মীয় পরিভাষা। যারা ধর্ম মানে তারা এই সব শব্দ বিভিন্ন যুগে ব্যবহার করে এসেছেন।

– সমাপ্ত –

FIRKABAZEE, KUFUREE FATUA
O
ISLAM

By : Ahmad Taufiq Choudhury

Published by :
Amadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211